সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন তত্ত্ব

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তাবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এই মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে। সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী দুটি মতধারা হল (ক) একত্ববাদ ও (খ) বহুত্ববাদ। এছাড়া, সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মতবাদগুলি হল : সীমাবদ্ধ ও বিভাজিত সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব এবং সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত মার্ক্সীয় তত্ত্ব।

একত্ববাদী তত্ত্ব (*Monistic Theory*)

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত আদি ও প্রধান তত্ত্বটি হল একত্ববাদী তত্ত্ব। একত্ববাদকে সার্বভৌমিকতার 'চিরায়ত' বা 'পরম্পরাগত' তত্ত্ব বলেও অভিহিত করা হয়। এটি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার চরম (absolute) মতবাদ হিসাবেও আখ্যায়িত হয়ে থাকে। এই মতবাদের মুখ্য প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন বোঁদা (Bodin), গ্রোটিয়াস (Grotius), হব্স (Hobbes), রুশো (Rousseau), জন অস্টিন (John Austin) প্রমুখ। কোকার অবশ্য কেবলমাত্র বিশ্লেষণী আইন বিজ্ঞানের প্রবক্তা বা বিশ্লেষণী আইনবিদদের (analytical jurists) একত্ববাদী বলে অভিহিত করেছেন। বিশ্লেষণী আইনবিদদের অন্যতম জন অস্টিন হলেন একত্ববাদের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা। তিনি সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে একত্ববাদী ধারণাকে হাজির করেছেন।

একত্ববাদী তত্ত্ব অনুসারে সার্বভৌমিকতা হল অসীম, অবিভাজ্য বা এককেন্দ্রিক। কে.সি.সিয়াও (K.C. Hsiao) তাঁর *'Political Pluralism'* গ্রন্থে বলেছেন "A monistic state is one which possesses, or which should possess, a single source of authority that is theoretically

comprehensive and unlimited in its exercise. This unitary and absolute power is sovereignty, and the theory which affirms the existence of such sovereignty in the state is designated by the pluralist as monism." অর্থাৎ একত্ববাদ অনুসারে রাষ্ট্রের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে এবং রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা সামগ্রিক, অসীম, এককেন্দ্রিক ও চরম। রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য।

ষোল শতকের ফরাসী চিন্তাবিদ বোঁদা হলেন একত্ববাদী মতধারার প্রথম প্রবক্তা। তিনি বলেছেন সার্বভৌমিকতা হল রাষ্ট্রের সেই চরম ক্ষমতা যা আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। চুক্তিবাদী ইংরেজ দার্শনিক হবসের মতে রাজা বা স্বৈরশাসকের (despot) আইনগত সার্বভৌমিকতার আর ফরাসী রাষ্ট্রদার্শনিক রুশোর মতে 'সাধারণ ইচ্ছা'র কোন আইনগত সীমাবদ্ধতা নেই। একত্ববাদের অপর এক প্রবক্তা জেরিমি বেন্থাম সার্বভৌমকে চরম ক্ষমতাসম্পন্ন বলে গণ্য করেছিলেন। হেগেল রাষ্ট্রকে দেখেছেন সামাজিক বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর হিসাবে। রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে। তাই তিনি রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির সীমাহীন আনুগত্য প্রদর্শনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তবে একত্ববাদী তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হলেন জন অস্টিন (John Austin)। ১৮৩২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর *"Lectures on Jurisprudence"* নামক একটি গ্রন্থ। এতে তিনি আইনগত সার্বভৌমিকতার ধারণাকে তুলে ধরেন। তিনি সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্ণয় করে বলেছেন "যদি নির্দিষ্ট উর্দ্ধতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ অন্য কোন উর্দ্ধতনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করেন অথচ কোন বিশেষ সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনুগত্য প্রাপ্ত হন, তাহলে সেই সমাজে উক্ত নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ হল সার্বভৌম এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ-সহ সমাজটি হল একটি রাজনৈতিক এবং স্বাধীন সমাজ। তাঁর মতে, আইন হল "সার্বভৌমের আদেশ"।

একত্ববাদের প্রধান বক্তব্য তথা মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এইভাবে চিহ্নিত করা যায়।

প্রথমত, একত্ববাদ হল একটি আইনের তত্ত্ব বা আইনগত তত্ত্ব। এতে আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার প্রসঙ্গটি বিবেচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, একত্ববাদ অনুসারে আইনত রষ্ট্র চরম ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা সীমাহীন। ঐশ্বরিক বা স্বাভাবিক আইন অথবা প্রথাগত আইনের দ্বারা এই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নয়। একটি রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রের ক্ষমতাই সর্বোচ্চ।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য ও এককেন্দ্রিক। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের মধ্যে একটাই সার্বভৌম ক্ষমতার কেন্দ্র থাকতে পারে, একের বেশী নয়। একত্ববাদ অনুসারে একই রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রের অবস্থান অসম্ভব।

চতুর্থত, আইনের উৎস হল রষ্ট্র। সার্বভৌমের আদেশই হল আইন। সার্বভৌম শক্তিই হল আইনের স্রষ্টা। এই কারণে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

পঞ্চমত, সার্বভৌমিকতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য, অন্যকোন সংঘ বা গোষ্ঠীর নয়। এই কারণে রাষ্ট্রীয় ভূ-খন্ডের মধ্যস্থিত অন্য কোন সংঘ বা গোষ্ঠী আইনত রাষ্ট্রের চেয়ে উর্দ্ধতন হতে পারে না।

ষষ্ঠত, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা তার ভূ-খন্ডের মধ্যকার সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংঘের উপর প্রযোজ্য। কেউই আইনত রাষ্ট্রের আদেশ-নির্দেশকে অমান্য বা লঙ্ঘন করতে পারে না। রাষ্ট্রীয় আইন

লঙ্ঘন করলে রাষ্ট্র শাস্তি দিতে পারে। মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আইনসঙ্গত অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রেরই রয়েছে।

সপ্তমত, রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম ক্ষমতা নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকে। এই ক্ষমতা কোন অনির্দিষ্ট (যেমন, জনসাধারণ) বা নৈর্ব্যক্তিক (যেমন, সাধারণ ইচ্ছা) কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ, ইংল্যান্ডে এই ক্ষমতা রাজা সহ পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত রয়েছে।

অষ্টমত, যে নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষের হাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে ঐ কর্তৃপক্ষ সেই সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করেন। কিন্তু ঐ কর্তৃপক্ষ বাহ্যিক কোন কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে একত্ববাদের এই সাধারণ অবস্থান সত্ত্বেও একত্ববাদীদের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে। এই মতপার্থক্যগত কারণে একত্ববাদের দুটি প্রধান ধরন বা রূপ পরিলক্ষিত হয়েছে। ম্যাবট (J. D. Mabbot) তাঁর *The State and the Citizen* গ্রন্থে একত্ববাদের দুটি রূপ বা ধরনকে চিহ্নিত করেছেন। এই দুটি ভাগ হল বিমূর্ত একত্ববাদ (abstract monism) ও মূর্ত বা বাস্তব একত্ববাদ (concrete monism)। প্রথম ধারণাটি অনুসারে রাষ্ট্রের হাতেই সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডের মধ্যে অন্য কোন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ও অস্তিত্বের সম্ভাবনা অস্বীকৃত। অন্যদিকে দ্বিতীয় ধারণাটি অনুসারে রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যান্য সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে তারা রাষ্ট্রীয় আইনের অধীন। মূর্ত বা বাস্তব একত্ববাদে বলা হয় অন্যান্য সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের অধীনে থেকে কাজ করতে বাধ্য।

সমালোচনা : একত্ববাদীরা সার্বভৌমিকতা বিষয়ক ধারণার বিকাশ সাধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। কিন্তু সার্বভৌমিকতা বিষয়ক তাঁদের ধারণা সর্বাংশে ত্রুটিমুক্ত ও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়।

প্রথমত, একত্ববাদের বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ হল সার্বভৌমিকতা বিষয়ক এই তত্ত্বটি সার্বভৌমিকতার বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দেয় না। একত্ববাদের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগের প্রধান কারণ হল (ক) বাস্তবে সার্বভৌম ক্ষমতা কখনই চরম ক্ষমতা নয়, (খ) এই ক্ষমতা সীমাহীন ও নিরঙ্কুশ নয়, (গ) এমনকি সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্যও নয়।

বাস্তবে সার্বভৌম ক্ষমতার উপর নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ; যেমন, সংবিধান, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি, জনমত ইত্যাদির দ্বারা প্রভূত পরিমাণে তা নিয়ন্ত্রিত। এ ছাড়া বিধি-নিষেধ কিংবা সমাজে প্রচলিত নৈতিক সীমাকে অতিক্রম করা সার্বভৌমের পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, সার্বভৌম ক্ষমতাকে অবিভাজ্য বলাও যুক্তিসঙ্গত নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক এই দু'ধরনের সরকারের অস্তিত্ব ও তাদের মধ্যে ক্ষমতার সংবিধানিক বিভাজন দেখা যায়। জনগণের আনুগত্য এই দু-ধরনের সরকারের প্রতি বিভক্ত থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা বিভাজিত হয়।

তৃতীয়ত, সীমাবদ্ধ সার্বভৌমতার তত্ত্ব অনুসারে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিক থেকেই সীমাবদ্ধ। আভ্যন্তরীণ দিক থেকে এই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নৈতিক সীমা, সাংবিধানিক বিধিনিষেধ ইত্যাদির দ্বারা এবং আন্তর্জাতিক দিক থেকে এই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ আন্তর্জাতিক আইন, চুক্তির শর্তাদি ইত্যাদির দ্বারা।

চতুর্থত, বহুত্ববাদীদের মতে, সমাজে রাষ্ট্র এককভাবে এই ক্ষমতার অধিকারী এই ধারণা ঠিক নয়। রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলিও সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদার। ল্যাস্কি, ক্রাবে, দ্যুগুই প্রমুখ বহুত্ববাদীদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অবিভাজ্য বা চূড়ান্ত নয় এবং রাষ্ট্রও সর্বশক্তিমান নয়।

পঞ্চমত, আইন সার্বভৌমের আদেশ—একত্ববাদীদের এই বক্তব্যটি বহুত্ববাদীরা সঠিক বলে মনে করেন না। দ্যুগুই (Duguit)-এর মতে সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা থেকেই আইনের উদ্ভব হয়। ক্রাবের (Krabbe) মতে সমাজের ন্যায়বোধ থেকে আইনের উদ্ভব হয়। অন্যদিকে হেনরি মেইন (Henry Maine) মনে করেন প্রথা, রীতিনীতি ইত্যাদির বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই আইনের জন্ম হয়।

ষষ্ঠত, চরম ও সীমাহীন সার্বভৌমিকতার ধারণাটি ক্ষতিকারক ও বিপদজনক। অধ্যাপক ল্যাস্কির (Laski) মতে, রাষ্ট্রের চরম সার্বভৌম ক্ষমতা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অন্যান্য সংঘ ও প্রতিষ্ঠানে অস্তিত্ব ও কার্যধারার পক্ষে যেমন ক্ষতিকারক তেমনি তা বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপদজনক, কেননা তা সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা বাড়িয়ে তোলে।

অনেকেই সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্বকে অবাস্তব ও 'আইনের অলীক কল্পনা' (legal fiction) বলে মনে করেন। একত্ববাদ রাজনৈতিক ও গণসার্বভৌমিকতার তত্ত্বের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একত্ববাদী তত্ত্ব অতিমাত্রায় আইনকেন্দ্রিক—একই সঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার একত্ববাদ সার্বভৌমিকতার আইনগত ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে। একথাও অস্বীকার করা যায় না যে আইনের দৃষ্টিতে সার্বভৌমিকতা চরম ও সীমাহীন ও অবিভাজ্য। একত্ববাদের শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা অস্টিন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতার ক্ষেত্রে জনমত বা সমাজের ন্যায়নীতির প্রভাবকে অস্বীকার করেন নি। অধ্যাপক কোকার (Coker) এর মতে অস্টিন সার্বভৌমিকতাকে শক্তির সঙ্গে একাত্মকরণ করেন নি। আইনের দৃষ্টিতে একত্ববাদ অভ্রান্ত। এই তত্ত্বের মূল ত্রুটি এখানেই যে এতে সার্বভৌমিকতার আইনগত দিকটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে, বাস্তব দিকটির উপর নয়। কাজেই আইনের দিক না বাস্তবের দিক—কোন দিক থেকে দেখা হবে তার উপরই এই তত্ত্বের মূল্যায়ন নির্ভর করে। আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সার্বভৌমিকতা সংক্রান্ত একত্ববাদের ব্যাখ্যা ও অবস্থান সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে দেখলে এই মতবাদটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েই যায়, কারণ, আইন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও আইন ও বাস্তব জীবনের মধ্যে ফারাক রয়েছে। এই ফারাক যে আইনকেন্দ্রিক বা অতিমাত্রায় আইনানুগ তা একত্ববাদী তত্ত্ব থেকে পরিস্ফুট হয় না।

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে অস্টিনের মতবাদ

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত ধারণাটির আলোচনায় জন অস্টিনের (John Austin) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তিনি সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা নন ঠিকই, কিন্তু এই ধারণার একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা। তিনি হলেন সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে একত্ববাদী ধারণার একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা। আইন সম্পর্কে বিশ্লেষণবাদী মতধারার (analytical school) সমর্থক জন অস্টিন একত্ববাদী তত্ত্বকে সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ ও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

জন অস্টিন ছিলেন একজন বিশিষ্ট ইংরেজ আইনজ্ঞ। তিনি প্রথম জীবনে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। কিন্তু পরে তিনি আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও আইনজ্ঞের পেশা গ্রহণ করেন।

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে মতবাদ হল রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর একমাত্র বিশিষ্ট অবদান। কিন্তু এ সম্পর্কিত তাঁর ধারণা তাঁকে রাষ্ট্রচিন্তার জগতে বিশিষ্ট স্থান প্রদান করেছে।

Lectures on Jurisprudence হল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। এটি ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে তাঁর মতবাদকে উপস্থাপন করেছেন। সার্বভৌমিকতা সম্পর্কিত তাঁর ধারণা হবস (Hobbes) ও বেন্থামের (Bentheam) শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তিনি বেন্থামের মতোই আইন ও নৈতিকতার মধ্যে এবং রাষ্ট্রীয় আইন ও প্রথা, রীতিনীতি ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করতে চেয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিশুদ্ধ আইনকেন্দ্রিক এবং তিনি আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বভৌমিকতার ধারণাটি উপস্থাপিত করেছেন।

অস্টিনের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের মধ্যে নির্দিষ্ট সমাজে সার্বভৌমের অবস্থান নির্ণয় এবং আইনের উৎস নির্ধারণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তিনি সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্ণয় করে বলেছেন, "যদি নির্দিষ্ট উর্দ্ধতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ অন্য কোন উর্দ্ধতনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করেন অথচ কোন বিশেষ সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনুগত্য প্রাপ্ত হন, তাহলে সেই সমাজে উক্ত নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ হল সার্বভৌম এবং উক্ত কর্তৃপক্ষসহ সমাজটি হল একটি রাজনৈতিক এবং স্বাধীন সমাজ"।

অস্টিনের মতে একটি স্বাধীন রাজনৈতিক সমাজে সার্বভৌম হল নির্দিষ্ট এবং চরম ক্ষমতা সম্পন্ন। সার্বভৌমের ইচ্ছা সীমাহীন, অবিভাজ্য ও অচ্ছেদ্য। এই চরম ও সীমাহীন ক্ষমতাসম্পন্ন সার্বভৌমের ইচ্ছাই হল আইন। তাঁর মতে সার্বভৌমের আদেশ হল আইন। আইনের স্রষ্টা হল সার্বভৌম। এই আইন সংশ্লিষ্ট সমাজের সদস্যরা মেনে চলতে বাধ্য। আইনের উল্লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু সার্বভৌম নিজেই যেহেতু আইনের স্রষ্টা কাজেই সে তাঁর তৈরী আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।

অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি (Harold Laski) অস্টিনের সার্বভৌমিকতা বিষয়ক ধারণার তিনটি প্রধান দিক চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত, অস্টিনের মতে রাষ্ট্র হল একটি আইনগত ব্যবস্থা (a legal order)। রাষ্ট্রের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ হল সকল ক্ষমতায় চূড়ান্ত উৎস। কোন অনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ (যেমন জনসাধারণ) অথবা নৈর্ব্যক্তিক কর্তৃপক্ষ (যেমন রুশো কথিত 'সাধারণ ইচ্ছা') 'সার্বভৌম' এই অভিধায় ভূষিত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন। তৃতীয়ত, সার্বভৌমের আদেশই হল আইন। আইন উল্লঙ্ঘন করলে রাষ্ট্র শাস্তি প্রদান করতে পারে।

সার্বভৌমিকতার প্রসঙ্গে অস্টিনের মূল বক্তব্যগুলিকে এইভাবে সূত্রাকারে তুলে ধরা যেতে পারে :

(১) স্বাধীন রাজনৈতিক সমাজেই সার্বভৌম শক্তির সন্ধান মেলে। অন্যভাবে বলা যায়, সার্বভৌম শক্তির অস্তিত্ব স্বাধীন রাজনৈতিক সমাজের অস্তিত্বকে সূচিত করে। অর্থাৎ একটি অন্যটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

(২) একটি স্বাধীন রাজনৈতিক সমাজে সার্বভৌম হল নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ। এই মানবীয় কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির সমবায়ে গঠিত হতে পারে। এখানে ঐ মানবীয় কর্তৃপক্ষ এক না একাধিক ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত সেটা বড় প্রশ্ন নয়। ঐ কর্তৃপক্ষ একাধিক ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত হলেও তা একজন ব্যক্তির লক্ষণ বিশিষ্ট হবে যাতে করে তাকে নির্দিষ্ট করা যায়।

(৩) ঐ নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সমাজের অধিকাংশ সদস্যের স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ

করবে। অর্থাৎ সদস্যদের আনুগত্য হবে স্বভাবজাত, অবিরাম, নিয়মিত ও অব্যাহত। বলপ্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে কদাচিৎ।

(৪) সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ সমরূপ কোন বাহ্যিক কর্তৃপক্ষের কাছে আনুগত্য প্রদর্শন করেন না। বাহ্যিক কর্তৃপক্ষের কাছে আনুগত্য প্রদর্শন উক্ত সমাজকে স্বাধীন রাজনৈতিক সমাজের স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করে। আসলে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ অন্য কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে মেনে চলেন না।

(৫) আইন হল সার্বভৌমের আদেশ। সার্বভৌমের ইচ্ছাই আইনীরূপ পরিগ্রহ করে। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষই হল আইনের স্রষ্টা। আইন হল উর্দ্ধতন কর্তৃক নিম্নতনকে প্রদত্ত আদেশ ('command given by a superior to an inferior')।

(৬) সার্বভৌম ক্ষমতা হল নির্দিষ্ট ও মানবীয়, কিন্তু একই সঙ্গে তা অসীম, চরম, অচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য, সর্বব্যাপক ও স্থায়ী।

অস্টিনের সার্বভৌমিকতা সংক্রান্ত মতবাদটি একটি বিশুদ্ধ আইনগত মতবাদ। তিনি বিশ্লেষণ মূলক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর কাছে রাষ্ট্র হল একটি আইনগত ব্যবস্থা। এই আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় প্রতিটি রাষ্ট্রে একটি নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর এই ক্ষমতা হল চরম সীমাহীন, অবিভাজ্য, সর্বব্যাপক ও স্থায়ী ক্ষমতা। সেই সার্বভৌমের আদেশেই হল আইন।

সমালোচনা : অস্টিনের মতবাদ সার্বভৌমিকতা বিষয়ক মতবাদগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু একইসঙ্গে একথাও উল্লেখ্য যে মতবাদটি ত্রুটিহীন ও সমালোচনার উর্দ্ধে অবস্থিত নয়। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মতবাদিক অবস্থান থেকে মতবাদটির সমালোচনা করেছেন।

প্রথমত, সার্বভৌম ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট উদ্ধর্তন মানবীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকে—অস্টিনের এই বক্তব্যটি অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। ঐতিহাসিক মতধারার আইনশাস্ত্রজ্ঞগণ (historical jurists) মনে করেন অস্টিনের এই ধারণা সঠিক নয়। স্যার হেনরি মেইন (Sir Henry Maine) এর মতে একমাত্র বিকৃত মস্তিক স্বৈরশাসকই এর একমাত্র উদাহরণ হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সার্বভৌম ক্ষমতা হল চরম ও আইনত অসীম—অস্টিনের এই বক্তব্যও যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক—উভয় দিক দিয়েই সীমাবদ্ধ। ব্লুন্টসলি মনে করেন, "The state as a whole is not almighty, for it is limited externally by the rights of other states and internally by its own nature and by the rights of its individual members" অর্থাৎ রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা বাহ্যিক দিক থেকে অপরাপর রাষ্ট্রের অধিকারসমূহ, আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির শর্তাদির দ্বারা সীমাবদ্ধ। আর আভ্যন্তরীণ দিক থেকে ঐ ক্ষমতা রাষ্ট্রের নিজের প্রকৃতি, সদস্যদের অধিকার, নীতি-নৈতিকতা, ইত্যাদির দ্বারা সীমাবদ্ধ।

তৃতীয়ত, আইন সংক্রান্ত অস্টিনের ধারণা ত্রুটিপূর্ণ। আইন সার্বভৌমের আদেশ—একথা বহুত্ববাদীরা মানেন না। ডুগুই (Duguit) এর মতে সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা থেকে আইনের উদ্ভব হয়। ক্রাবের (Krabbe) মতে সামাজিক ন্যায়বোধ হল আইনের উৎস। অন্যদিকে হেনরি মেইন মনে করেন প্রথা, রীতিনীতি ইত্যাদির বিবর্তনের মধ্য দিয়েই আইনের উদ্ভব হয়।

চতুর্থত, সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে অস্টিনের ধারণা এ বিষয়ে গণ সার্বভৌমিকতা তত্ত্ব ও রাজনৈতিক

ফারাক রয়েছে। একথা মেনে নিলে বলতেই হয়, ... অস্টিনের সার্বভৌমিকতা বিষয়ক ধারণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য যথেষ্ট সীমাবদ্ধ।

বহুত্ববাদী তত্ত্ব (Pluralistic Theory)

সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে একত্ববাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে যে সকল বিরূপ প্রতিক্রিয়া তাত্ত্বিক সুসংবদ্ধতার আকারে প্রকাশ পেয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল বহুত্ববাদী মতবাদ। বহুত্ববাদ হল শিল্পায়ন ও গণতন্ত্রের প্রসার ও ফলশ্রুতিজাত নানাবিধ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট থেকে রাষ্ট্রীয় চরমতাবাদের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া। একইসঙ্গে বহুত্ববাদ হল সংঘস্বাতন্ত্র্যের ও আন্তর্জাতিক আন্তঃনির্ভরশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার তত্ত্বটি পুনঃনির্মাণের এক বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সার্বভৌম ক্ষমতার বিভাজনের কাম্যতা ও অনিবার্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে বহুত্ববাদ।

বিভিন্ন দেশের বহু বিশিষ্ট চিন্তাবিদের লেখনীতে সার্বভৌমিকতা বিষয়ক বহুত্ববাদী ধারণাটি প্রকাশিত ও বিকশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে জার্মানীর অটো গিয়ার্কে (Otto Gierke) ও ইংল্যান্ডের মেইটল্যান্ডকে (F.W. Maitland) পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া হয়। এছাড়াও বহুত্ববাদী মতবাদের বিশিষ্ট প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন লিও দ্যুগুই (Leon Duguit), এইচ ক্রাবে (H. Krabbe), জি.ডি. এইচ. কোল (G.D.H. Cole), হ্যারল্ড ল্যাস্কি (Harold Laski), এ.ডি.লিন্ডসে (A.D.Lindsay), আর.এম. ম্যাকআইভার (R.M. McIver), আরনেস্ট বার্কার (Ernest Barkar), এম.পি.ফোলেট (Miss M.P. Follet) প্রমুখ। এই সকল চিন্তাবিদেরা আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিস্থানীয় প্রবক্তার ভূমিকা নিয়েছেন।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিশ শতকের গোড়াতে বহুত্ববাদী তত্ত্বের বিকাশ ও বিস্তার পরিলক্ষিত হয়। এর উদ্ভব ও বিকাশ নানাবিধ কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এসবের মধ্যে রয়েছে : (ক) শিল্পায়নের ফলস্বরূপ জটিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনসমূহের বিকাশ, (খ) গণতন্ত্রের প্রসার, (গ) রাষ্ট্রের বর্দ্ধিত কার্যাবলী ও সে সম্পর্কে জনমানসে প্রতিক্রিয়া, (ঘ) স্বেচ্ছাসেবী সংঘ ও গোষ্ঠীসমূহের বিস্তার ও জনজীবনে ক্রমবর্দ্ধমান গুরুত্ব বৃদ্ধি, (ঙ) জনসাধারণের সামাজিক অস্তিত্ব ও আনুগত্যের ধরনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন, (চ) আন্তর্জাতিক আন্তঃনির্ভরশীলতা ও তার ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি। এসবের পরিণতিতে প্রথমে ব্রিটেনে ও তারপরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও ফ্রান্সে সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একইসঙ্গে সার্বভৌমিকতার প্রশ্নটি ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে বহুত্ববাদ একটি বৌদ্ধিক আন্দোলনের আকার লাভ করে।

বহুত্ববাদী চিন্তাবিদেরা উপলব্ধি করেন যে, রাষ্ট্র ব্যক্তির সামাজিক প্রকৃতির আংশিক প্রকাশ মাত্র। রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট। ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রের প্রতিই আনুগত্যশীল নয়। রাষ্ট্র ব্যক্তির একচ্ছত্র আনুগত্যের একক দাবীদার নয়। ব্যক্তি তার জীবনের বহুমুখী প্রয়োজনে সৃষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংঘসমূহের প্রতিও আনুগত্য প্রদান করে থাকে। কাজেই একত্ববাদী চিন্তাবিদদের কথিত রাষ্ট্রের চরম, সীমাহীন, অবিভাজ্য সার্বভৌম কর্তৃত্বের ধারণাটিকে বহুত্ববাদী চিন্তাবিদগণ সঠিক বলে গণ্য করেন নি। পরিবর্তে বহুত্ববাদীগণ রাষ্ট্রের প্রকৃতির পুনঃসংজ্ঞায়িতকরণ ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ধারণাটি পুনঃনির্মাণের চেষ্টা করেছেন।

স্পষ্টতই, বহুত্ববাদের দুটি দিকে রয়েছে—নেতিবাচক ও ইতিবাচক দিক। নেতিবাচক দিক থেকে বহুত্ববাদ হল একত্ববাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও তার সমালোচনা মাত্র। একত্ববাদের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদের মূল সমালোচনাগুলি হল :

প্রথমত, বহুত্ববাদীদের মতে, সমাজে রাষ্ট্র এককভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এই ধারণা ঠিক নয়। ল্যাস্কি, ক্রাবে, দ্যুগুই প্রমুখ বহুত্ববাদীদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অবিভাজ্য ও চূড়ান্ত বা চরম নয় এবং রাষ্ট্রও সর্বশক্তিমান নয়।

দ্বিতীয়ত, আইন সার্বভৌমের আদেশ—একত্ববাদীদের এই বক্তব্যটি বহুত্ববাদীরা সঠিক বলে মনে করেন না। দ্যুগুই মতে সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা থেকে আইনের উদ্ভব হয়। ক্রাবের মতে সামাজিক ন্যায়বোধ হল আইনের উৎস। ল্যাস্কির মতে আইনের উৎস হল ব্যক্তির বিবেক। ব্যক্তির ইচ্ছা আকঙ্ক্ষাগুলি পূরণ করলে তবেই কোন আইন ব্যক্তির মান্যতা আনুগত্যের দাবীদার হতে পারে।

বহুত্ববাদের ইতিবাচক বক্তব্যটি হল এই যে রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতাকে এককভাবে ভোগ করে না। রাষ্ট্রকে ঐ ক্ষমতা সামাজিক সংঘ ও গোষ্ঠী সমূহের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করতে হয়। অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য নয়, বরং বিভাজ্য। ব্যক্তির চাহিদা বিচিত্র ও বহুমুখী। রাষ্ট্রের একার পক্ষে সেইসব দাবিদাওয়া ও চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তির চাহিদা পূরণের জন্য গড়ে উঠেছে বহুসংখ্যক ও বিভিন্ন ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংঘ। এইসব সংঘগুলিও রাষ্ট্রের মতোই ব্যক্তির বিভিন্ন দাবী-দাওয়া পূরণ করে থাকে। সংঘগুলিও রাষ্ট্রের মতোই ব্যক্তির জীবনে বিশেষ উপযোগী ভূমিকা পালন করে থাকে। কাজেই একমাত্র রাষ্ট্রই ব্যক্তির আনুগত্যের দাবীদার হতে পারে না। অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলিও ব্যক্তির আনুগত্যের দাবীদার। স্বভাবতই ব্যক্তির আনুগত্য লাভের জন্য রাষ্ট্রকে ঐ সব সংঘ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়।

বহুত্ববাদীদের মতে, স্বেচ্ছাসেবী গোষ্ঠীগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট নয়, তারা ব্যক্তির দাবী ও চাহিদা পূরণের জন্য সৃষ্ট হয়ে থাকে। তারা তাদের সদস্যদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই কারণে তারা ব্যক্তির আনুগত্য লাভ করে থাকে। তারা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কাজেই সার্বভৌম ক্ষমতার উপর রাষ্ট্রের একচ্ছত্র ও স্থায়ী অধিকার নেই। এইভাবে স্বেচ্ছাসেবী সংঘগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠায় সার্বভৌম ক্ষমতা বিভক্ত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র এককভাবে এই ক্ষমতার অধিকারী নয় ; অন্যান্য সামাজিক ও ঐচ্ছিক সংঘগুলিও বিভিন্ন মাত্রায় এই ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা বিভাজ্য।

বহুত্ববাদীদের মতে, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সুনির্ধারিত এবং রাষ্ট্র ব্যক্তির সামাজিক প্রকৃতির আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র। রাষ্ট্র কখনোই ব্যক্তির বহুমুখী ও বিচিত্র জীবন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সামগ্রিকতাকে অন্তর্গত করে না। এই কারণে বহুত্ববাদী মতবাদ মানুষের অপরাপর সংঘগুলির মধ্যে অন্যতম সংঘ হিসাবে রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে পুনর্নির্ধারণ করতে চায়। বহুত্ববাদ বিভিন্ন সংঘের বিরোধমূলক দাবিসমূহের মধ্যে মীমাংসাকারকরূপে রাষ্ট্রের এক নতুন ভূমিকার কথা বলে থাকে। এইভাবে বহুত্ববাদ ব্যক্তির আনুগত্যলাভের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একান্ত ও চূড়ান্ত দাবীকে নাকচ করে থাকে। স্বভাবতই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা যেমন চরম ও চূড়ান্ত নয়, তেমনি তা অবিভাজ্য নয়। কেবলমাত্র রাষ্ট্র এই ক্ষমতার একমাত্র দাবীদার নয়, অন্যান্য সংঘগুলিও যুক্তিসংগতভাবে এই ক্ষমতার দাবীদার।

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বহুত্ববাদী ধারণার মূল বক্তব্যগুলি হল : (ক) সমাজ প্রকৃতিগতভাবে বহুত্ববাদী ও যুক্তরাষ্ট্রীয়, (খ) রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন নয় ; (গ) রাষ্ট্রের মতোই অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংঘগুলি ব্যক্তির জীবনের বহুমুখী চাহিদা ও দাবী দাওয়া পূরণে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। (ঘ) রাষ্ট্র এককভাবে চরম ও অ-বিভাজ্য ক্ষমতার অধিকারী নয়। (ঙ) ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রের প্রতিই আনুগত্যশীল নয় ; ব্যক্তির আনুগত্য ও সেই সুবাদে সার্বভৌম ক্ষমতা বিভাজ্য। (চ) সমাজে রাষ্ট্রের ভূমিকা সমন্বয়কারীর বা মীমাংসাকারকের (ছ) আইন সার্বভৌমের আদেশ নয়, আইন হল সামাজিক প্রয়োজন অথবা ব্যক্তির ন্যায়বোধের অভিব্যক্তি মাত্র (জ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌমের অবস্থান নির্ণয় খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সমালোচনা : বহুত্ববাদী তত্ত্বের গুরুত্ব এখানেই যে, এতে একত্ববাদীদের মতো সার্বভৌমিকতার ধারণাটিকে একটি বিশুদ্ধ আইনগত ধারণা হিসেবে গণ্য করা হয়নি। পরিবর্তে এতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বভৌমিকতার সমস্যার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এসত্ত্বেও একথা মনে রাখা উচিত সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বহুত্ববাদী ধারণা সমালোচনার উর্দ্ধে নয়।

প্রথমত, বহুত্ববাদী সার্বভৌমিকতা বিষয়ক একত্ববাদী ধারণার ভ্রান্ত উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়েছে। হেগেল বাদে বোঁদা, হবস, রুশো অথবা অস্টিন প্রমুখ কোন একত্ববাদী চিন্তাবিদই রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান বলে গণ্য করেননি। অথবা তাঁরা এই মত পোষণ করেননি যে রাষ্ট্র সমালোচনার উর্দ্ধে ও প্রতিস্পর্ধাহীন, অথবা নাগরিকরা রাষ্ট্রকে অমান্য ও প্রতিরোধ করতে পারেন না। তাঁদের মূল কথা হল রাষ্ট্রও কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে গ্রহণ করেনা এবং রাষ্ট্র কারও অধীনতা স্বীকার করে না।

দ্বিতীয়ত, বহুত্ববাদী চিন্তাবিদ্গণ নিজেরাও তাঁদের বক্তব্য ও দাবির বিষয়ে পরিষ্কার নন। অধ্যাপক এফ.ডাবলু. কোকার (F.W.Coker) বহুত্ববাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির কথা উল্লেখ করে বলেছেন একত্ববাদীদের দ্বারা রাষ্ট্রকে প্রদত্ত কোন্ কোন্ কাজের দায়িত্ব থেকে রাষ্ট্রকে তাঁরা বঞ্চিত করবেন সে বিষয়টি পরিস্ফুট করতে বহুত্ববাদীগণ ব্যর্থ হয়েছেন।

তৃতীয়ত, বহুত্ববাদী তত্ত্ব অন্তঃদ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ ও অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। তাঁরা ব্যক্তির জীবনে গোষ্ঠী ও সংঘের গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্ণয় করেছেন ঠিকই, কিন্তু রাষ্ট্র ও সংঘের মধ্যকার সম্পর্ককে সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারেন নি। একদিকে তাঁরা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে গোষ্ঠী ও সংঘসমূহের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে চেয়েছেন। অন্যদিকে তাঁরা প্রকারান্তরে সমাজে রাষ্ট্রের বিশেষ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকার করেছেন। যেমন, উদাহরণস্বরূপ ফোলেট (Miss Follet) বলেছেন "The state is a unifying agency"। আবার বহুত্ববাদীরা নৈরাজ্যবাদীদের মতন রাষ্ট্রের অবলুপ্তির পক্ষপাতি না হলেও তাঁদের বক্তব্য কার্যত রাষ্ট্রের অবলুপ্তি সূচিত করে বলে কেউ কেউ মনে করেন। যেমন আর্শীভাথম (Asirvatham) তাঁর *Political Theory* তে মন্তব্য করেছেন "The pluralists dont want to abolish the state as the Anarchist and the syndicalists wish to do, although the logical outcome of their theory may well be the same—abolition of the state"

চতুর্থত, বহুত্ববাদ শান্তি ও ঐক্যকে বিপন্ন করে ও নৈরাজ্যবাদকে উৎসাহিত করে। রাষ্ট্র সমাজের বিরুদ্ধে শক্তি ও দাবিসমূহের মধ্যে নিরপেক্ষ সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে শান্তি ও ঐক্য বজায় রাখতে সাহায্য করে থাকে। বহুত্ববাদী ধারণা গ্রহণ করলে এর বদলে সমাজে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লব দেখা দেবে। গিলক্রীস্ট (Gilchrist) বলেছেন "Pluralism is a doctrine of

জনগণের সার্বভৌমিকতার বা গণসার্বভৌমিকতার তত্ত্ব

সার্বভৌমিকতার ধারণাটিকে গণতান্ত্রিক রূপপ্রদানের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় গণ-সার্বভৌমিকতার তত্ত্বে। ব্যক্তি ও ব্যক্তিসংসদ, অথবা সংঘ ও গোষ্ঠীসমূহের পরিবর্তে এই তত্ত্বে জনসাধারণকে

সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস ও অধিকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গণসার্বভৌমিকতার তত্ত্ব সার্বভৌমিকতার প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে একত্ববাদ ও বহুত্ববাদ থেকে এক ভিন্নতর বক্তব্য হাজির করেছে। এই তত্ত্বের এই বক্তব্যগত বিশিষ্টতা ও গণতান্ত্রিক অভিমুখীনতা গণসার্বভৌকিতার তত্ত্বটিকে রাষ্ট্রচিন্তার জগতে বিশিষ্ট স্থান প্রদান করেছে।

গণসার্বভৌমিকতার তত্ত্বটি এক অর্থে বহু প্রাচীন, কারণ, রোমান সাম্রাজ্যের গোড়ার দিকে এর প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে। রোমান দার্শনিক সিসেরোকে (Cicero) এই তত্ত্বের আদি প্রবক্তা বলা যেতে পারে। তিনিই প্রথম জনগণকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'The authority of the commonwelth is derived from the corporate power of the people'. পরবর্তীকালে চোদ্দ থেকে ষোল শতকের মধ্যে, এই বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত হয় ওকহ্যাম, পাদুয়ার মারসিগ্‌লিও, আলথুসিয়াস প্রমুখ চিন্তাবিদদের লেখনীতে। তবে তাঁরা মধ্যযুগের অবসানকালে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অসহনীয় প্রেক্ষাপটেই গণসার্বভৌমিকতার ধারণাটিকে তুলে ধরেন। তাঁরা সকলে এই ধারণা পোষণ করতেন যে জনগণই হল প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

অবশ্য গণ-সার্বভৌমিকতার ধারণাটি গুরুত্ব অর্জন করে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। এক্ষেত্রে ফরাসী চিন্তাবিদ রুশোর (Rousseau) নাম সর্বাগ্রগণ্য। তিনি হলেন এই তত্ত্বের একজন শক্তিশালী প্রবক্তা। তাঁর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বে গণসার্বভৌমিকতার ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। রুশোর গণ-সার্বভৌমত্বের মূল কথা হল "জনগণের কণ্ঠস্বরই হল ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর" ("Vox populi vox dei" অর্থাৎ "Voice of the People is the voice of the God")। এই তত্ত্বের অপর বলিষ্ঠ প্রবক্তা হলেন মার্কিন চিন্তাবিদ জেফারসন (Jefferson)। প্রকৃতপক্ষে ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীন যুদ্ধের অন্যতম তাত্ত্বিক-আদর্শগত ভিত্তি ছিল গণসার্বভৌমিকতার ধারণা।

জনগণের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের মূল কথা হল—জনগণই হল সকল ক্ষমতার উৎস। কাজেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ অথবা গোষ্ঠী ও সংঘসমূহ নয়, সকল ক্ষমতার মালিক হল জনগণ। এই ধারণাই হল সত্যিকারের গণতন্ত্রের মূলকথা। তাই লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) তাঁর *Modern Democracies* গ্রন্থে বলেছেন "Popular sovereignty is the basis and watchword of democracy". আধুনিক কালের উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহের মতাদর্শগত ভিত্তিই হল এই গণসার্বভৌমিকতার ধারণা।

শুধুমাত্র উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহের ক্ষেত্রেই নয়, সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে গণসার্বভৌমিকতার ধারণাটি যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করেছে। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের (ব্রেজনেভ) সংবিধানের ২নং ধারাতে বলা হয়েছিল "সোভিয়েত ইউনিয়নে সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত"। একইভাবে বর্তমান (১৯৮২ সালের) গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সংবিধানের ২নং ধারাতেও বলা হয়েছে "গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সমুদায় ক্ষমতা জনগণের।" কাজেই উদার গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই—গণসার্বভৌমিকতার ধারণাটির গুরুত্ব ও স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়।

গণসার্বভৌমিকতা বিষয়ক ধারণার মূলকথাগুলি হল ঃ (ক) জনগণই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার অধিকারী, (খ) সরকার হল জনস্বার্থের প্রতিফলক ও জনইচ্ছাকে কার্যকর হাতিয়ার স্বরূপ অর্থাৎ

সরকার হল 'জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের সরকার', (গ) জনগণের এবং জনমত গঠন ও প্রতিফলনকারী মাধ্যমসমূহের স্বাধীনতা স্বীকৃত হবে, (ঘ) সরকার জনমতের প্রতি সংবেদনশীল হবে ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাসমূহের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে, (ঙ) জনমত প্রকাশের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক বা পরোক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ কার্যকর থাকবে। রিচির (Ritche) মতে জনসাধারণ দু'ভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠতে পারে। জনসাধারণ নির্বাচনী শক্তির সাহায্যে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। এটি হল প্রত্যক্ষ পদ্ধতি। অথবা জনসাধারণ পরোক্ষভাবেও এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। তিনি এই পরোক্ষ পদ্ধতি বলতে প্রভাব বিস্তার, ভীতিপ্রদর্শন বা বিদ্রোহ করার সম্ভাবনার কথা বুঝিয়েছেন।

সমালোচনা : গণসার্বভৌমিকতার ধারণাটি নিঃসন্দেহে আকর্ষক এবং এর আবেদনও যথেষ্ট প্রভাবশালী। কিন্তু এর যথার্থতা ও বাস্তব গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়।

প্রথমত, জনগণ বলতে কাকে বোঝায় সে বিষয়ে স্পষ্টতার অভাব রয়েছে। জনগণ বলতে যদি রাষ্ট্রের সমগ্র জনসমষ্টিকে, অর্থাৎ অনির্দিষ্ট জন-সাধারণকে বুঝিয়ে থাকে তবে স্পষ্টতই তারা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। আসলে সার্বভৌমিকতা হল রাষ্ট্রনামক প্রতিষ্ঠানের এক প্রয়োজনীয় গঠনকারী উপাদান। আর এই রাষ্ট্র হল কার্যত রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমষ্টি। কাজেই সার্বভৌমিকতার ধারণা হল অনির্দিষ্ট জনসাধারণ ও অসংগঠিত জনমতের সঙ্গে সাযুজ্য ও সঙ্গতিহীন।

দ্বিতীয়ত, জনগণের সার্বভৌমিকতাকে নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত প্রতিফলিত হয় ঠিকই। কিন্তু সেই সংখ্যা গরিষ্ঠ নির্বাচক মণ্ডলী কার্যত রাষ্ট্রের সমগ্র জনসমষ্টির সংখ্যা লঘিষ্ঠ অংশ মাত্র। কাজেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের সার্বভৌমিকতার যে প্রকাশ ঘটে থাকে তা হল রাষ্ট্রের সমগ্র জনসমষ্টির সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের সার্বভৌমিকতা মাত্র।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের নীতি ও কর্মপন্থা যে কেবলমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমে অভিব্যক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়—এমন নয়। তা নির্বাচন ব্যতিরেকেও অন্যান্য সময় বহুবিধ সংগঠিত শক্তি ও সংঘের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর মতামতকে অথবা এই সব সংগঠিত গোষ্ঠী ও সংঘের চাপ সৃষ্টির শক্তিকে গণসার্বভৌমিকতা বলে ধরা হবে সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

চতুর্থত, জনমত কিংবা বিপ্লবের শক্তিকে গণসার্বভৌমিকতার প্রকাশ বলে ধরে নেওয়া সমীচীন নয়। কেননা, জনমত সংগঠিত না হলে তা হয়ে ওঠে অনির্দিষ্ট ও গুরুত্বহীন। আর তা যখন সংগঠিত হয় তখন তা সমগ্র জনগণের মতামত থাকে না। আবার বিপ্লবের শক্তিকে গণসার্বভৌমিকতা বলা যায় না, কেননা বিপ্লব কখনো আইনানুমোদিত হতে পারে না। অথচ সার্বভৌমিকতার ধারণাটি হল মূলগতভাবে একটি আইনগত ধারণা।

পঞ্চমত, গণসার্বভৌমিকাতর ধারণাটি হল একটি বিমূর্তায়ন (an abstraction), কেননা

প্রশ্ন ১। সার্বভৌমিকতা কাকে বলে?

উত্তর। সার্বভৌমিকতা হল রাষ্ট্রের চরম, অপ্রতিহত ও চূড়ান্ত ক্ষমতা। বোদাঁর মতে, সার্বভৌমিকতা হল "আইনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত নাগরিক ও প্রজাদের ওপর রাষ্ট্রের অবাধ ও চূড়ান্ত ক্ষমতা।" এই ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন নীতি অনুসরণ করতে পারে।

প্রশ্ন ২। অস্টিন প্রদত্ত সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা দাও।

[C.U. '85, '91; V.U. '91, '93]

উত্তর। অস্টিন সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা দেন এইভাবে ঃ "যদি কোনো নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি অপর কোনো অনুরূপ উর্ধ্বতনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির সহজাত আনুগত্য লাভ করেন, তখন সেই নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সেই সমাজে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং ঐ কর্তৃত্বসহ উক্ত সমাজ রাজনৈতিক ও স্বাধীন"।

প্রশ্ন ৩। সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর। *[C.U. '82]*

উত্তর। সার্বভৌমিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ (ক) মৌলিকতা বা চরমতা, (খ) সার্বজনীনতা, (গ) স্থায়িত্ব, (ঘ) অবিভাজ্যতা এবং (ঙ) অহস্তান্তরযোগ্যতা।

প্রশ্ন ৪। সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য হিসাবে সার্বজনীনতার অর্থ কী? see

[C.U. '86 ; V.U. '89]

উত্তর। এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বব্যাপকতা বোঝায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রতিটি

ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর সার্বভৌমিকতা সমানভাবে প্রযোজ্য হয়, তবে বিদেশী কূটনীতিক বা রাষ্ট্রদূতগণ সার্বভৌমিকতার আওতার বাইরে থাকেন। কিন্তু রাষ্ট্র যেহেতু স্বেচ্ছায় এই সীমা স্বীকার করে নেয়, সেজন্য একে সার্বভৌমিকতার সীমা বলা চলে না।

প্রশ্ন ৫। বাস্তব সার্বভৌমিকতা কী? *[C.U. '87, '89 ; V.U. '91]*

উত্তর। যখন কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ বলপূর্বক আইনানুমোদিত সার্বভৌমকে উচ্ছেদ করে নিজের বা নিজেদের ইচ্ছাকে চূড়ান্তভাবে কার্যকর করতে সক্ষম হয়, তখন সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদকে বাস্তব সার্বভৌম বলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী পোল্যাণ্ড দখল করলে জার্মান শাসকগণ পোল্যাণ্ডের বাস্তব সার্বভৌমে পরিণত হন।

প্রশ্ন ৬। আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য কী? *[C.U. '87, '95]*

উত্তর। আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে চূড়ান্ত শাসন ক্ষমতা যার হাতে থাকে তাকে আইনানুমোদিত সার্বভৌম বলে। অপরপক্ষে, আইনের অনুমোদন ছাড়াই যখন কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ বলপূর্বক আইনানুমোদিত সার্বভৌমকে উচ্ছেদ করে নিজের বা নিজেদের ইচ্ছাকে চূড়ান্তভাবে কার্যকর করতে সক্ষম হয়, তখন সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদকে বাস্তব সার্বভৌম বলা হয়। আইনানুমোদিত সার্বভৌমের ভিত্তি হল আইন, অপরপক্ষে বাস্তব সার্বভৌমিকতার ভিত্তি হল বাস্তব অবস্থা এবং প্রকৃত ক্ষমতা।

প্রশ্ন ৭। আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। *[C.U. '95 ; T.U. '93]*

উত্তর। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত অধিকার ভোগ করে তাকেই আইনগত সার্বভৌম বলে গণ্য করা হয়। ব্রিটেনের রাজা-সহ পার্লামেন্ট আইনগত সার্বভৌমের উদাহরণ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় প্রত্যেক দেশে আইনগত সার্বভৌমের পিছনে আর একটি শক্তি থাকে যার কাছে আইনগত সার্বভৌমকে নতি স্বীকার করতে হয়। ডাইসি একে রাজনৈতিক সার্বভৌম বলেছেন। আইনগত সার্বভৌম নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনৈতিক সার্বভৌমের দ্বারা। তবে আইনগত সার্বভৌম যেরূপ নির্দিষ্ট, রাজনৈতিক সার্বভৌম সেরূপ নির্দিষ্ট নয়।

প্রশ্ন ৮। জনগণের সার্বভৌমিকতা বলতে কী বোঝায়? *[C.U. '88, '90 ; V.U. '95, T.U. '88]*

উত্তর। জনগণের সার্বভৌমিকতা তত্ত্বের মূল কথা হল এই যে, জনগণই হল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রকৃত উৎস। জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণা অনুসারে জনগণের সম্মতিই হল রাষ্ট্রের ভিত্তি। এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা হলেন ফরাসী দার্শনিক রুশো। প্রকৃত অর্থে জনগণের সার্বভৌমিকতা বলতে শাসনব্যবস্থার ওপর জনগণের নিয়ন্ত্রণকে বোঝায়।

প্রশ্ন ৯। সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে একত্ববাদী তত্ত্বের মূল প্রবক্তা কারা?

উত্তর। একত্ববাদী তত্ত্বের মূল প্রবক্তারা হলেন বোদাঁ, হবস, বেন্থাম, অস্টিন প্রমুখেরা।

প্রশ্ন ১০। সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে একত্ববাদী তত্ত্বের মূল বক্তব্য কী? *[C.U. '93]*

উত্তর। সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল এই যে, (ক) রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা হল চরম, অবাধ ও অবিভাজ্য ; (খ) আইন হল সার্বভৌমের আদেশ এবং সেই কারণে সার্বভৌম শক্তি আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় ; (গ) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সার্বভৌমের নির্দেশ মেনে চলতে হবে ; (ঘ) সার্বভৌম

ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রের ক্ষমতা, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতা ভোগ বা দাবি করতে পারে না।

প্রশ্ন ১১। সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বহুত্ববাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের নাম লেখ। *[V.U. '90, '93, **B.U.** 2000]*

উত্তর। সার্বভৌমিকতার বহুত্ববাদী তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তারা হলেন—লিণ্ডসে, বার্কার, ম্যাকাইভার, হবসন, কোল, ল্যাস্কি প্রমুখেরা।

প্রশ্ন ১২। আন্তর্জাতিক আইন কি রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে?

উত্তর। অনেকের মতে, আধুনিককালে প্রতিটি রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলতে হয়, তাই আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আন্তর্জাতিক আইন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তির দ্বারা ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে রচিত। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক আইনকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করার কোনো ব্যবস্থা নেই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রায়শই আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।

প্রশ্ন ১৪। সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। *[C.U. '96]*

উত্তর। লর্ড ব্রাইস, ব্লুন্টস্‌লি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় দিক থেকেই সীমাবদ্ধ। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নাগরিক অধিকার, জনমত, প্রচলিত প্রথা, শাসনতান্ত্রিক আইন, ধর্মীয় অনুশাসন, নৈতিকতা প্রভৃতির দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ। আর বাহ্যিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতি, চুক্তি, বিশ্বজনমত, অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকার প্রভৃতি দ্বারা সার্বভৌমিকতা সীমাবদ্ধ।

প্রশ্ন ১৫। রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা কি সীমাহীন?

উত্তর। রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা সীমাহীন নয়। বিভিন্ন প্রকার আন্তর্জাতিক আইন, প্রথা, চুক্তি, বিশ্ব-জনমতের উপেক্ষা করে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া বাহ্যিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহ যদি সীমাহীন ক্ষমতা ভোগ করতে চায়, তাহলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন ১৬। সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে একত্ববাদী তত্ত্বটি কী?

উত্তর। সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে আইনগত মতবাদকে (Juristic theory) সাধারণভাবে একত্ববাদ বলা হয়। এই তত্ত্বে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে চরম, অবাধ্য, অসীম ও অবিভাজ্য বলে মনে করা হয়। কে. সি. সিয়াও (K. C. Hsiao)-এর মতে, একত্ববাদ হল সেই তত্ত্ব যা বিশ্বাস করে সকলপ্রকার কর্তৃত্বের উৎসস্থল একটিই এবং যা সীমাহীন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলে।

প্রশ্ন ১৭। বহুত্ববাদ কী?

উত্তর। বহুত্ববাদ হল সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ। এই তত্ত্বে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব ও আইনগত সার্বভৌমিকতার ধারণার বিরোধিতা করা হয় এবং একই সঙ্গে সমাজের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন সংঘ বা গোষ্ঠী রাষ্ট্রের মতই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচার করা হয়।

প্রশ্ন ১৮। বহুত্ববাদের মূল বক্তব্য কী? *[V.U. '91]*

উত্তর। বহুত্ববাদের মূল বক্তব্যগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কোনভাবেই চরম, অসীম ও অবিভাজ্য নয়;